অধ্যায় ৫ : আধুনিক বাংলা নাটক—৩

বিন্যাসক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি
৫.৪ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের চরিত্র
৫.৫ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের সংলাপ
৫.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৫.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.৮ অতিরিক্ত পঠন
৫.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন—

- 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি থেকে জানতে পারবেন স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়, প্রিয়জন সবাই থাকা সত্ত্বেও বেঁচে মরার মতো মনে বেদনা, হাহাকার, নৈরাশ্য নিয়ে মানুষকে কীভাবে সারা জীবন কাটাতে হয়। তা জানতে পারবেন।
- নাটকের প্রতিটি চরিত্র সময়ে নিরিখে মনের দিক থেকে যে ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তা আধুনিক জীবন যাত্রার কথাই ধরা পরে। এই সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে যুগ-যন্ত্রণার কাতর আর্তি যে ভাবে ধ্বনিত হতে দেখা গিয়েছে তা থেকে শিক্ষার্থীরা সহজেই জানতে পারবেন সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপটি। এই সকল বিষয় জানতে পারবেন।

৫.২ পরিচিতি

বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি ১৯৬৭ সালে 'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করেছে। কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ সব বিষয়ে নাট্যকার অভিনব উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। নাটকের মধ্যে গল্প রচনার পদ্ধতি এক নতুন মাত্রা দিয়েছে নাটকটিকে। চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে হাহাকার নৈরাশ্য সময়ের

কাছে হেরে যাওয়া মন-মানসিকতা। নাট্যকার চরিত্রগুলির মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ছোট ছোট সংলাপ বসিয়ে তাদের প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলেছে।

৫.৩ বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি

বাদল সরকার 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি চিরাচরিত প্রথা না মেনে, গল্প রচনার ছলে ছোট ছোট কয়েকটি গল্পের সমন্বয়ে নাটকটির কাহিনি নির্মাণ করেন। নাটকে মূল চরিত্র শরদিন্দু ও বাসন্তীর সাহিত্য রচনার সূত্রে একজন ব্যক্তি (সীতানাথ)-র আত্মহত্যার কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাটকটি এগিয়ে গিয়েছে। সীতানাথ চক্রবর্তীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা নিয়ে রচিত ভিন্নধর্মী তিনটি কাহিনি তিনটি অঙ্কে বিভাজিত হয়ে পরিশেষে একটি পরিণতির কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। নাটকের তিনটি অঙ্ক তাতে কোনও দৃশ্য বিভাজন ছিল না। নাটকটির কাহিনি শুরু হয়েছে ভবানীপুরের এক প্রাচীন তেতলা বাড়ির দোতলায় শরদিন্দু নাগের ফ্লাটের বর্ণনায়। রবিবার সকালে। কিছু পরে বাসুদেবের রেখে যাওয়া খবরের কাগজের পাতায় সীতানাথ নামক এক নিঃসন্তান ব্যক্তির উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার কাহিনি দেখা জিয়েছে। তাই দেখে শরদিন্দুর মনে পড়ে বটানিক্যাল গার্ডেনে আলাপ হওয়া ভবানীপুরের নিঃসন্তান সীতানাথ চক্রবর্তীর কথা। শরদিন্দু কলেজের জন্য 'নাট্যসাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধ লিখতে ভিতরের ঘরে চলে যায়, কিন্তু দেখা গিয়েছে বাসন্তী বসে বসে ভাবতে থাকে এবং শুরু হয় তার সীতানাথ ও কণাকে নিয়ে গল্প লেখা। প্রথম অঙ্কেই দেখা যায় বাসন্তী নতুন গল্প লেখা শুরু করেছে। স্ত্রী কণা ও সীতানাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে। তারা নিঃসন্তান দম্পতি। সীতনাথ কেন আত্মহত্যা করল-তাই-ই ছিল গল্পের প্লট।

নাটকে কিছু পরে দেখা গিয়েছে সীতানাথের আত্মহত্যাকে অবলম্বন করে শরদিন্দু গল্প লিখতে শুরু করে। শরদিন্দুর গল্পে এসেছে বিজয় চরিত্রটি। এ গল্পটির শুরু হয় সীতানাথের স্নান করতে যাওয়া থেকে। সীতানাথ এখানে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এ গল্পের শুরুতেই সীতানাথকে দেখা যায় এক উদভ্রান্ত বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগী রূপে। তাকে নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। পরে জানা যাবে তার স্বরূপ-প্রকৃতি। শরদিন্দু-কল্পিত গল্পের এই কণা ও সীতানাথের দাম্পত্যজীবন বেশ সুখেরই ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক ঘটনা সুখী-সুন্দর দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং কোনও এক অজানা ভুল বা অপরাধ-বোধ থেকে সৃষ্টি হয় করুণ ট্রাজেডি-স্বেচ্ছামৃত্যু বা আত্মহত্যা। তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়েছে শরদিন্দুর লেখা গল্পে সীতানাথের পরিণতির পরিচয় দিয়ে। শরদিন্দু সীতানাথ সম্পর্কিত এই গল্পটি লেখা শেষ করে ভাল-মন্দ জানার জন্য স্ত্রী বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করে। শরদিন্দুর কল্পিত গল্পটি অতি উৎকৃষ্ট বলে মন্তব্য করে বাসন্তী। শরদিন্দু ও বাসন্তীর কথোপকথন থেকে জানা যায় সীতানাথের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে নানা কথা। সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে শরদিন্দু ও বাসন্তী কল্পিত-সম্ভাব্য কারণ দেখিয়ে গল্প রচনা করেছে। সীতানাথের আত্মহত্যার বিষয়টা ঢুকে গেছে তাদের মাথায়। এই গল্প নিয়ে আর বাসন্তীর যেন ভাল লাগে না। বাসন্তী ঘুমোতে যায়। শরদিন্দুর ঘুম পায়নি এবং ঘুমাতে যায়নি। শরদিন্দু একা অনির্দিষ্ট ভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে, কিছুক্ষণ ঘুরে নিজের মহাভারতের ছবি, প্রাচীন মিশরের ছবি, রোমান সম্রাটের নৌবিহার, রোমের কলোসিয়ম, মধ্যযুগের ইউরোপ, নেপোলিয়নের জয়যাত্রার ছবি, সাহারা

মরুভূমির বাণিজ্যপথ, আলাবামার তুলো ক্ষেত, প্রথম মহাযুদ্ধের ছবি, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি, ভিয়েতনামের ছবি ইত্যাদি। বেছে বেছে এই সমস্ত খবরের ছবি কেন জমা করেছে জানতে চাওয়ায় সীতানাথ বলেছে-এই তো মানুষের ইতিহাস, মানুষের জীবনের ইতিহাস। শরদিন্দু যখন বলে যে-মিথ্যা কথা,-এ আসলে মৃত্যুর ইতিহাস। তখন সীতানাথ হেসে বলে মৃত্যুকে বাদ দিয়ে জীবনের ইতিহাস হয় না। প্রত্যুত্তরে শরদিন্দু বলে মৃত্যুর ইতিহাস জীবনের ইতিহাস হতে পারে না। তখন সীতানাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা ইতিহাস হয়তো আছে, এ ইতিহাস তা নয়, এ মানুষের জীবনের বাকি ইতিহাস। সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করেছে জানতে চাইলে শরদিন্দুকে পাল্টা প্রশ্ন করে সীতানাথ বলে সে এখনও আত্মহত্যা করেনি কেন? শরদিন্দুর জবাব বাঁচতে চায় বলেই মরতে চায় না। সীতানাথ জানায় অনেকেই এভাবে বাঁচতে চায় না; যারা বেঁচেই থাকে, সীতানাথের মতো আত্মহত্যা করে মরে না, তারা আসলে বেঁচে থেকেও মরেই আছে। শরদিন্দু এ কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তার যুক্তি মানুষ হয় বাঁচবে, না-হয় মরবে। সীতানাথ তৎক্ষণাৎ বলে সেইজন্যই সে মরেছে। শরদিন্দু কেন এখনও আত্মহত্যা করেনি তা সীতানাথ জানতে চাইলে শরদিন্দুর প্রত্যুত্তর-তার স্ত্রী আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, চাকরি আছে, বাঁচতে ভাল লাগে, তাই মরতে চায়নি। সীতানাথ প্রত্যুত্তরে বলে তার জীবনের অতীত ইতিহাস-তারও সব ছিল, তবুও আত্মহত্যা করতে হয়েছে। সে উনিশ বছর আগে উনিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তখন মনের আনন্দের আবেগে পৃথিবী সুন্দর ছিল, মানুষ সজীব ছিল, জীবন মূল্যবান ছিল। বাকি ইতিহাস-পরীক্ষা নয়, চাকরি নয়, কণা বা বাসন্তী নয়, অর্থাৎ স্ত্রীর রমণীয় সুখ-শান্তি মাত্র নয়; বাকি ইতিহাস-দাঙ্গার ইতিহাস, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, রাশি রাশি বছরের হত্যা-নির্যাতন-যন্ত্রণার ইতিহাস, কুরু-পাণ্ডব, সিকন্দর, নীরো, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ন, হিটলালের ইতিহাস।

হাজার হাজার বছরের যে সমস্ত ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলোসিয়াদের বালিতে, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোসিমার পোড়ামাটিতে লেখা রয়েছে সেই বাকি ইতিহাসের প্রকৃত ইতিহাস। আর এ ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। নির্যাতন, হত্যা, দাঙ্গা, যুদ্ধ-সবই চলবে, সব কিছু মানুষই করবে, অথচ মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু'বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে।

যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষের ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এই মানুষই আবার জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। আসলে বাঁচবার ভাণ করছে মাত্র। জীবনের অর্থ যখন থাকছে না, তখন অভ্যাসকে সম্বল করে বাঁচবার ভান করছে। যেমন সীতানাথ করেছিল, শরদিন্দু করছে। শরদিন্দু প্রতিবাদ করে বলে, ইতিহাসের আর একটা দিক আছে, যুদ্ধের অন্য পিঠে শান্তি আছে, নির্যাতনের অন্য পিঠে ভালবাসা আছে নিশ্চয়। তা না হলে সবাইকে আত্মহত্যা করতে হয়। সীতানাথ ধীর ধৈর্যে বলে,

"অন্য সবাই পারে শরদিন্দু। না বেঁচে, না মরে পারে।" [পৃষ্ঠা-৬৩]।

অর্থাৎ সীতানাথের কাছে জীবনের অর্থহীনতায় জীবন-মৃত্যু একাকার-অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব একাকার।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৪ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের চরিত্র

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যকার বাদল সরকারের নাম খুবই পরিচিত। নাটকের প্রধান উপাদান হল চরিত্র। W. H. Hudson বলেছেন, 'Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.' নাট্যচরিত্রের মাধ্যমেই নাট্যকার তুলে ধরেন নাট্যবিষয়। চরিত্রের সক্রিয়তা ও সজীবতার উপরে নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা। প্রধান ও অপ্রধান সব চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ-তারা কেউই নিতান্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপখণ্ড রূপে গড়ে উঠতে পারে না। ১৯৬৫ খ্রীঃ নাটকটির প্রকাশ ও কিছু পরে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে। প্রচলিত নাটকে সাধারণত নাট্যকার নাটকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন না-তিনি আড়ালেই থাকেন, যদিও নাটকের সব চরিত্র তাঁরই সৃষ্ট। যুগে যুগে, দেশে দেশে সমাজ-মানসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চরিত্রায়ণেও নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সব দেশেই লৌকিক কোন ব্যক্তির চরিত্র বিচার এবং নাট্যচরিত্র বিচারের মানদণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার সে নাটক যদি উদ্ভট নাটক হয়, তবে তার চরিত্র-বিশ্লেষণ আরও জটিল হয়ে পড়ে। এ কারণে অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্রের ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক ভাবে আলবেয়ার কামুর ধারণাকেই প্রাধান্য দিতে হয়-'The feeling of absurdity is produced when alienation is seen in man and his life, actor and his setting." [Preface: Absurd Drama]

আলোচনার সুবিধার্থে চরিত্রগুলিকে নারী ও পুরুষ রূপে ভাগ করা হয়েছে।

- **পুরুষ চরিত্র**

শরদিন্দু

নাট্যকার বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকের মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র শরদিন্দু। নাট্যকাহিনি সৃষ্টি ও বিকাশে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকাহিনির উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রমপরিণতি ধরা পড়ে শরদিন্দু ও তার স্ত্রী বাসন্তীর দাম্পত্য জীবন এবং এক রবিবারের ছুটির দিন কাটানো প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই। নাটকের তিনটি অঙ্কে তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। নাটকের প্রথম অঙ্কে বাসন্তীর সঙ্গে শরদিন্দুর দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় অঙ্কে সীতানাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে

বাসন্তীর রচিত গল্পের সমালোচক ছিল ও পরে সীতানাথকে নিয়ে তার নতুন ভাব-ভাবনামূলক গল্পের রচয়িতা রূপে পরিচয় দেয় এবং তৃতীয় অঙ্কে শরদিন্দু যেন সীতানাথের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

ভবানীপুরের এক পুরাতন তেতলা বাড়ির দোতলায় শরদিন্দু নাগের বাড়ি। তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিল। শিক্ষিতা স্ত্রী-বাসন্তীকে নিয়ে তার এগারো বছরের দাম্পত্যজীবন। নাটকে দেখা যায় ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার এক বছর পরে তার বাবা মারা যায়। তাই অত্যন্ত কষ্ট করে ২২ বছর বয়সে এম. এ. পাশ করে-একটা কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পায় এবং তার ঠিক দুই বছর পরে অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সে স্কুল শিক্ষিকা বাসন্তীকে বিবাহ করে। শরদিন্দু ছিল ভাববিলাসী ও একটু ভুলমনা স্বভাবের। মাঝে মাঝে সংসারের কাজকর্মের কথা তার বেশিরভাগ সময় মনেই থাকে না; এই বিশেষ দিকটি ধরা পরে স্ত্রী-বাসন্তী ও তার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। তেরো বছর থেকে সে কলেজের লেকচারার আছে, রীডার বা প্রফেসর হবার তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। শরদিন্দু শুধু প্রাবন্ধিক ছিল না, একজন দক্ষ গল্প লেখকও ছিল। এমনি স্ত্রীকে গল্প লেখায় প্রেরণাও জুগিয়েছিল। শরদিন্দুর কথায়-

"কল্পনা করবে-ঘটনাটা কেন ঘটল? সীতানাথ চক্রবর্তী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে-এটা ঘটনা। কোন্ সারিবাঁধা ঘটনাবলীর চূড়ান্ত ফলে ঘটনাটা ঘটেছে-তাই কল্পনা করে গল্প লেখ।" [তদেব, পৃষ্ঠা: ১০, প্রথম অঙ্ক]।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শরদিন্দুরই নতুন রহস্য উন্মোচিত হয়। শরদিন্দুকে বলতে শোনা যায়-

"আমার গল্পটা সম্ভব, কিন্তু সত্যি ঘটনাটা কিছুতেই আমার গল্পের মতো নয়।" [তদেব-পৃষ্ঠা: ৫১, তৃতীয় অঙ্ক]।

আমরা জানতে পেরেছি সীতানাথের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বাসন্তী এবং শরদিন্দুও কেউ জানত না।

পরিশেষে বলা যায় শরদিন্দু সীতানাথের মতো আত্মহত্যা না করেও আমৃত্যু সে দুর্বার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মানুষের জীবনে নানান আঘাত-যন্ত্রণা-সমস্যা-সংকুলতা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু নয়, তাকে বরণ করে নিয়েই যে জীবনে ও বেঁচে থাকা-তার-ই সার্থক হয়ে উঠেছে এই শরদিন্দু চরিত্রায়ণে।

সীতানাথ

নাট্যকার বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতানাথ নয়। অথচ তাকে কেন্দ্র করেই শরদিন্দু ও বাসন্তীর গল্প রচনা এবং নাট্য ঘটনার সৃষ্টি। পরিশেষে দেখা যায় তারই মাধ্যমে জীবনের বাকি ইতিহাস-দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণার বিষাদ প্রকাশিত হয়েছে; সেদিক দিয়ে তাকে নায়কও বলা চলে। নাটকের মধ্যে সীতানাথ চরিত্র চার বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত।

(ক) বাস্তব বা প্রকৃত সীতানাথের আত্মহত্যার কাহিনি (প্রথম অঙ্ক)

(খ) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে বাসন্তীর ধারণা বা উপলব্ধি (প্রথম অঙ্ক)

(গ) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে শরদিন্দুর ধারণা বা উপলব্ধি (দ্বিতীয় অঙ্ক)

(ঘ) সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করল সে সম্পর্কে স্বয়ং সীতানাথের বক্তব্য (তৃতীয় অঙ্ক)

সুতরাং নাটকের তিনটি অঙ্কেই তার উপস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতা নাট্যকাহিনিকে সার্থকতা দান করেছে।

নাটকে শরদিন্দু ও বাসন্তীর আলাপচারিতায় বাস্তব বা প্রকৃত সীতানাথের কথা ধরা পড়েছে। খবরের কাগজ থেকে শরদিন্দু 'উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা'র কথা বলে এবং পরে মনে হয় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যাকারী সীতানাথ চক্রবর্তী তাদেরই যেন পরিচিত।

বাসন্তী-রচিত গল্পের সীতানাথ এক নির্মম ট্র্যাজেডির শিকার হওয়া চরিত্র। সীতানাথ ও কণা দুই জন স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি সুখের সংসার। সীতানাথের ধনী বন্ধু নিখিল। সীতানাথ একটা অফিসে চাকরি করে। গড়িয়ায় জমি কিনেছে। কণার লক্ষ্য পূরণ করতে সে ক্রীত জমিতে নিজের বাড়ি তুলবে। কিন্তু একদিন সেই জমি, ব্যাঙ্কের টাকা সবই শেষ হয়ে যায় একটি মিথ্যাকে গোপন রাখতে। তাই স্বামীর এমন প্রতারণায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় সে জীবন বাঁচবার, ধন-সম্পদ-অর্থ পাবার পথ বেছে নিয়ে নিখিলের রক্ষিতা হয়ে চলে যায়। আর সেই-ই তাকে এমন নিঃসঙ্গ ভাবে রেখে চলে যাবার আঘাতে-বেদনায় সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

তৃতীয় অঙ্কে শরদিন্দু গল্পের শেষে বলে সীতানাথের আর কোন চিন্তা নেই। এক প্রগাঢ় প্রশান্তি, এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্ততায় তার ক্ষত-বিক্ষত মন আবিষ্ট। আর চিন্তা বা ভয় নেই তার। কড়িকাঠে গাঁথা বাঁকানো লোহার থকে পরম মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে সে। এই হল খবরের কাগজে প্রকাশিত সীতানাথের মৃত্যু-সম্পর্কিত শরদিন্দুর অনুভূতি বা উপলব্ধি।

সীতানাথের আত্মহত্যার বিষয়টা ঢুকে গেছে শরদিন্দুর মাথায়। বাসন্তী ঘুমাতে গেলেও শরদিন্দুর ঘুম পাচ্ছে না এবং ঘুমাতেও গেল না। কিছুক্ষণ পর সহসা শরদিন্দু সীতানাথের উপস্থিতি অনুভব করে এবং সীতানাথই জানায় সে কেন আত্মহত্যা করেছে।

সীতানাথ বলে সে কেন মরল তা শরদিন্দু বা বাসন্তী বা কণা-কেউই বুঝতে পারেনি। শরদিন্দুর মতো সেও কাটিং রাখে; তবে খবরের নয়, খবরের ছবির। যেমন মহাভারতের ছবি, প্রাচীন মিশরের ছবি, রোমান সম্রাটের নৌবিহার, রোমের কলোসিয়াম, মধ্যযুগের ইউরোপ, নেপোলিয়নের জয়-যাত্রার ছবি, সাহারা মরুভূমির বাণিজ্য পথ, আলাবামার তুলোক্ষেত, প্রথম মহাযুদ্ধের ছবি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি-ইত্যাদি বাছাই করা খবরের ছবি। এই সমস্ত মানুষের ইতিহাস, জীবনের ইতিহাস সংগ্রহে সে শ্রম

ঢেলেছে। শরদিন্দু যখন বলে যে, এ আসলে মৃত্যুর ইতিহাস; তখন সীতানাথ স্মিতহাস্যে বলে মৃত্যুকে বাদ দিয়ে জীবনের ইতিহাস হয় না এবং আরও বলে আলাদা আলাদা মানুষের আলাদা আলাদা ইতিহাস হয়ত আছে কিন্তু এ ইতিহাস বা গৌরী প্রসঙ্গে কোন এক অস্বাভাবিকতা দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধে থাকায় মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ ছিল না এবং তারই ফলে তার আত্মহত্যা সুযুক্তিসঙ্গতই হয়েছে। তার মতে কিশোরী ধর্ষণকারী বয়স্ক পুরুষ ডাকাতেরই সামিল। সে ডাকাত সমাজ, সভ্যতা ও নৈতিকতার শত্রু; সেই ডাকাতের অবশ্যই ফাঁসি হওয়া উচিত। তাই তার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত অবাস্তব বা আকস্মিক নয়, অনেক চিন্তারই ফলশ্রুতি।

তৃতীয় অঙ্কে শরদিন্দু গল্পের শেষে বলে সীতানাথের আর কোন চিন্তা নেই। এক প্রগাঢ় প্রশান্তি, এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্ততায় তার ক্ষত-বিক্ষত মন আবিষ্ট। এই হল খবরের কাগজে প্রকাশিত সীতানাথের মৃত্যু-সম্পর্কিত শরদিন্দুর অনুভূতি বা উপলব্ধি। পরে দেখা গিয়েছে সীতানাথের আত্মহত্যার বিষয়টা ঢুকে গেছে শরদিন্দুর মাথায়। বাসন্তী ঘুমাতে গেলেও শরদিন্দুর ঘুম যায়নি এবং ঘুমাতেও গেল না। কিছুক্ষণ পর সহসা শরদিন্দু সীতানাথের উপস্থিতি অনুভব করে এবং সীতানাথই জানায় সে কেন আত্মহত্যা করেছে।

সীতানাথের মতো তার কাছেও জীবনের অর্থহীনতায় জীবন-মৃত্যু একাকার-অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব একাকার। তাই শরদিন্দু সীতানাথেরই প্রভাবে জীবনের দুর্বহ বাকি ইতিহাসের ভার বহন করেই বেঁচে থাকে। বাকি ইতিহাসের চিন্তা ও চেতনায় সেও ক্লান্ত-ক্ষত-বিক্ষত-যা তার মানসিক আত্মহত্যারই নামান্তর। "শরদিন্দু দু-হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।"[তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৬৬]। সুতরাং ঘটনা বা কাহিনি সৃষ্টিতে, নিজের এবং অন্য চরিত্রের অন্তর রহস্য উন্মোচনে ইত্যাদি বহু দিক দিয়ে সীতানাথ চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাসুদেব

ভবানীপুরের কোনও এক অপ্রশস্ত রাস্তায় কোনও এক পুরাতন তেতলা বাড়ির দোতলায় শরদিন্দু নাগ ও বাসন্তী নাগ দম্পতির বাড়ি। শরদিন্দু একটা কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বাসুদের তাদের কলেজেরই একজন ফিলজফির অধ্যাপক। কিন্তু বাসুদেবের আগমন, আচরণ ও সংলাপে এক মুহূর্তেই তার চরিত্র-প্রকৃতি উন্মোচিত হয়ে যায়।

"শুড মর্নিং শরদিন্দুদা। হ্যাপি সান্ডে। গুড মর্নিং বৌদি। চা কই?" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৪]।

বাসন্তী চা তৈরি করার কথা বললে বাসুদেব যে উক্তি করে তাতে বোঝা যায় সে প্রত্যেক রবিবারই আসে-চা খেয়ে যায়।

বাসুদেব উমেদার বা তোষামুদে প্রকৃতির কার্যসিদ্ধির জন্য কাউকে তেলাতে ওস্তাদ। সে সুযোগসন্ধানী। তাই কলেজের সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ভবতোষ মিত্তিরের মেয়ের বিয়েতে আর্টস বিভাগের অধ্যাপকরা বিশেষ কেউ না গেলেও সে যাবে। কেননা, সেখানে প্রিন্সিপাল যাবেন। সুযোগ বুঝে প্রিন্সিপালকে তোয়াজ করে দু'ছটাক তেল দিয়ে কিছু গুছিয়ে নেবার মানসিকতা তার। শরদিন্দুকেও সঙ্গী হতে বলে। কেননা, কলেজের বাংলা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হরেকৃষ্ণবাবু তার কলেজের চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চাকরিতে য়ে তে চান। আর তাহলে শরদিন্দুবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবেই। শরদিন্দু তেলাতে ইচ্ছুক না হলেও তার উক্তিতে ও হাবে-ভাবে পদের প্রতি বিশেষ লোভাতুর মানসিকতার পরিচয় ফুটে 'বাকি ইতিহাস'-এর নাট্যকাহিনি সৃষ্টি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সে গল্পের প্লট দিতে না পারলেও নাটকের প্লট দিয়েছে।

নাট্যকাহিনির সূচনায় বাসুদেবের আবির্ভাব যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তেমনি আবার তৃতীয় অঙ্কে এক চরম মুহূর্তে তার আবির্ভাব শরদিন্দুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং নাট্যকাহিনির পরিণতিও দান সুতরাং 'বাকি ইতিহাস'-এর নাট্যকাহিনি সৃষ্টি ও পরিণতি দানে এবং শরদিন্দু ও বাসন্তী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে ও পূর্ণতা সৃষ্টিতে বাসুদেব চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় হয়েছে।

নিখিল

সীতানাথ ও কণাকে নিয়ে রচিত বাসন্তীর গল্পে সীতানাথের বন্ধু নিখিলের পরিচয় আছে নাটকে কেবলমাত্র প্রথম অঙ্কে-তাও মাত্র দু'বার-একবার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে, আর একবার পরোক্ষে প্রথম অঙ্কের অন্তিমে অর্থাৎ বাসন্তী-রচিত গল্পের পরিণতিতে সীতানাথ ও কণার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। নিঃসন্তান দম্পতি সীতানাথ ও কণার দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেরই ছিল। সীতানাথ একটি অফিসে চাকরি করে, কণা গৃহকর্মে নিপুণা। নিখিল সীতানাথের বন্ধু হলেও বিশ্বাসঘাতক এবং নারীলোলুপ। কণার প্রতি তার সুতীব্র জৈবিক আকর্ষণ। যে কোন মূল্যে যে-কোন ভাবে সে কণাকে পেতে চায়। নিখিল সীতানাথের বাড়িতে এসে যখন দেখে যে সীতানাথ বাজারে গেছে, তখন তার মনের গোপন ক্ষুধা জেগে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে না পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। যেতে সে পারে-শুধু স্বামীর কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আঘাত বা কষ্ট বা অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা পায়নি বলেই। তবুও সে অবস্থা বুজে নিখিলের কাছে যাবার পথ প্রস্তুতও করে রাখে। নিখিল নারী-শিকারে ধুরন্ধর-ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারে-নারীর মনস্তত্ত্ব সে বোঝে। তাই কণার ভাব-মানসিকতায় সে বুঝতেই পারে ঠিক মতো টোপ দিতে পারলে এখন না হলেও পরে পাওয়া যাবে কণাকে। কণা নিখিলকে সেই একান্ত নির্ভরতার প্রস্তাব জানাতে চলল-যখন সে জানল তার স্বামী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, যে-কণাকে একান্তভাবে পাবার জন্য সীতানাথের এতটা ত্যাগ স্বীকার-সেই কণাই তাকে ছেড়ে তারই ধনী বন্ধুর রক্ষিতা হয়ে চলে গেছে জেনে সীতানাথ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। সুতরাং বাসন্তীর গল্পের তথা সীতানাথ চরিত্রের চরম পরিণতিতে নিখিলের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা, নিখিলের কাছেই একান্ত নির্ভরতা এবং অর্থ-সম্পদের আশ্বাসেই কণা ঘর ত্যাগ করায় অভিমানাহত সীতানাথ

আত্মহত্যা করেছে। নাট্যকাহিনিতে নিখিলের সবিশেষ পরিচয় নেই। এই নারী-লোলুপতা ছাড়া সীতানাথের উক্তিতে জানা যায় সে খুব ধনী-বাড়িতে দারোয়ান, খানসামা, সবকিছুই ছিল।

বিজয়

নাটকে সীতানাথকে দেখা যায় এক উদ্‌ভ্রান্ত-বিধান্ত-বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগীরূপে। তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। বিজয় এসেছে সীতানাথকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করা যায় কীভাবে সেইজন্য। সকলের মনে হবে সীতানাথ সুস্থ। কিন্তু কণা ও বিজয় জানে সে মানসিক রোগী। বিজয় বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ। সে জেনে গেছে সীতানাথ মানসিক রোগী। তাই সীতানাথের হাব-ভাব, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা কেমন প্রকৃতির তা কণাকে ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে জেনে নেয়। কণার কাছ থেকে বিজয় জেনেছে গত পরশু সীতানাথ স্কুল থেকে কি একটা বই নিয়ে এসে কণাকে এড়িয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে ভোর রাত্রে রান্নাঘরে গিয়ে পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সীতানাথ খুব কম ঘুমায়, ঘুমের মধ্যে কথা বলে, বেশির ভাগ কথা বোঝা যায় না এবং বলাবাহুল্য বেশির ভাগ কথা চম্বলগড় নিয়ে। বিজয় এও দেখেছে যে, সীতানাথ হিজিবিজি করে কি সব লেখে এবং চম্বলগড় ও পার্বতী লিখলে তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলে। বিজয় ধরতে পারে-এখানেই রহস্য-সীতানাথের মানসিক রোগের উৎপত্তি এখান থেকেই। তার এই রহস্য উন্মোচনের জন্য সে সর্বদা চেষ্টা করে কণার কাছ থেকে এই প্রসঙ্গে তথ্য জানতে। সে মনে প্রাণে চায় সীতানাথ শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। বিজয় সীতানাথের গল্প করার, দাবা খেলার সঙ্গী। সীতানাথের মানসিক অবস্থা আচার-আচরণ পরিদর্শনও তার লক্ষ্য। প্রত্যহ সে আসে। মানসিক রোগী নিয়ে কণা বিজয়ের উপর এত বেশি নির্ভরশীলা। বিজয়ের অবর্তমানে দিনে বা রাতে সীতানাথ কি আচরণ করে তা জানতে চাইলে কণা কিছু বলে এবং কিছু যেন চেপে রাখে। বিজয় কথার মার-প্যাঁচে চম্বলগড় ও পার্বতীর কথা জেনে নিতে চায় কণার কাছ থেকে। বিজয় বাড়িতে চলে যেতে চাইলেও সীতানাথ আটকে রাখে এবং বহুদিন-পোষিত মনের গোপন কথা ব্যক্ত করে-মধ্যপ্রদেশের চম্বলগড় জঙ্গলের পার্বতীর কথা।

সমগ্র 'বাকি ইতিহাস' নাটকে যতগুলি বন্ধুচরিত্র আছে তার মধ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসায়, আদর্শ বন্ধুত্বে, একান্ত নির্ভরশীলতায়, আস্থা-ভরসায় বিজয় শ্রেষ্ঠ, উত্তম মানসিকতায় উজ্জ্বল।

আগন্তুক (বেলিফ)

আগন্তুক বেলিফ চরিত্রটি প্রথম অঙ্কে একবার মাত্র তার উপস্থিতি। কণা সীতানাথকে তার অতীত দুঃখকথা বলে, বাবার জন্য অনুশোচনা করে। প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ব্যাঙ্কে জমিয়ে গড়িয়ায় জমি কিনে।

প্রথম অঙ্কে এক মুহূর্তমাত্র আগন্তুকের আগমন হলেও তার ভূমিকা কোনও অংশেই কম নয়। বরং বাসন্তী-রচিত কাহিনির জটিলতা ও পরিণতিতে তারই সার্থক ভূমিকা। তার কাছ থেকে গড়িয়ার জমি

মর্টগেজ হবার কথা শুনে জমি নেই, ব্যাঙ্কের টাকা নেই-কিছুই আর নেই জেনে এক মুহূর্তেই কণা পাল্টে যায় এবং স্বামীকে ত্যাগ করে নিখিলের রক্ষিতা হয়ে চলে যায়। ফলে স্বামী সীতানাথ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

জনৈক বৃদ্ধ

বাসন্তী-রচিত গল্পে প্রথম অঙ্কে জনৈক বৃদ্ধ অর্থাৎ কণার বাবা একবার মুহূর্তমাত্র আবির্ভূত হলেও কোনওভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগন্তুক বেলিফের আগমনে ব্যাঙ্কের টাকা, গড়িয়ার জমি কিছুই আর নেই জেনে এবং স্বামীর প্রবঞ্চনায় ও মিথ্যা আশ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় কণা বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সীতানাথও তাকে ধরার জন্য জামা গায়ে বাইরে বেরিয়ে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে পাথর হয়ে যায়। এই শীর্ণকায় বৃদ্ধটিই তার শ্বশুর-কণার বাবা। কণার বাবার এক স্ত্রী ও তিন কন্যা। বড় কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিল গরিব ঘরে। অনাহারে ও শ্বশুরবাড়ির খাটুনিতে বড় মেয়ে মারা যায়। মেজ মেয়ে বীণার বিয়ে হয়নি। থাকবার-পরবার মতো একটা আশ্রয় পেয়েছে মাত্র। অর্থাৎ মেজ মেয়ে অন্যের রক্ষিতা হয়েছে। তার স্ত্রী কাশতো আর কাশিতে রক্ত উঠত। শেষে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কণার বাবা অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে যান। তারপর হাসপাতালে আগুন লাগে। কণাসহ অনেকের ধারণা তাতে কণার বাবার মৃত্যু হয়।

কিন্তু সীতানাথের কথায় জানা যায় কণার পিতা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চুরি করে ধরা পড়ে জেলে যান কণার বাবা বৌকে মেরেছে, বড় মেয়েকে মেরেছে, মেজ মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আর কণার মনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সীতানাথ শ্বশুরের মুখ বন্ধ করতে অর্থাৎ কণার পিতার বেঁচে থাকার বিষয়টিকে গোপন রাখতে ব্যাঙ্কের টাকা, গড়িয়ার জমি যথাসর্বস্ব শেষ করেছে। আর কাছে সীতানাথ খুব স্নেহের পাত্র ছিল।

বিধুভূষণ

বিধুভূষণবাবু একজন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং সেই সময়ে সীতানাথ তাঁর ছাত্র ছিল। এখন তিনি সীতানাথের স্কুলের সেক্রেটারি। সীতানাথ যখন ছাত্র তখন থেকেই তিনি তাকে স্নেহ করতেন ও বিশ্বাস করতেন।

সীতানাথের স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র সীতানাথের কাছে না এসে সবাই দলে দলে বিধুবাবুর বাড়িতে যায় নালিশ জানাতে নয়, যদি অশোককে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় থাকে তার জন্য। আর বিধুবাবু তাই এসেছেন সীতানাথের কাছে। তিনি সীতানাথের কাছে আশানুরূপ ফল না পেয়ে চলে যান এবং সীতানাথকে বলে যান তাঁর নাতনি গৌরীকে দেখতে যাবার কথা। বিধুবাবু বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সীতানাথের রূঢ় আচরণে তিনি রেগে না গিয়ে বরং শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বরেই কথা বিধুভূষণবাবুর মিষ্ট কথায় সীতানাথ তুষ্ট হয় না; বরং রূঢ় ভাষায় কথা বলে। বিধুবাবু তাতে রাগেন না; বরং শান্তভাবেই বলেন

অশোক স্কুলের ভাল ও কৃতী ছাত্র। পরপর দু'বছর ফার্স্ট হয়ে সে ক্লাসে উঠেছে। তার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়েছে। আর তাছাড়া এটা তার প্রথম অপরাধ হিসেবেও মার্জনীয়। প্রত্যুত্তরে সীতানাথ বলে স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে মাত্র, ফাঁসির হুকুম তো হয়নি; তাই তার মতে এটা গুরুদণ্ড নয়। বিধুবাবু সীতানাথকে বুঝিয়ে বলেন বইটি খুব খারাপ নয়, বিদেশে অনেকে একে সাহিত্য বলে মেনেছে, ভারতবর্ষেরও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বইটিকে বে-আইনি করার মতো কিছু পাননি। তখন সীতানাথ সেটাকে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করে এবং বলে, যে বই বয়স্ক লোকেরা পড়লে ক্ষতি হয়, সেই বই অশোকের মতো চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেরা পড়লে-তাদের এক্সপেল করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রত্যুত্তরে বিধুবাবু বলেন যদি বইটি জোগাড় করে পড়ে তিনি দেখেন যে অশোকের এক্সপেল্ড হওয়াটা গুরুদণ্ড হচ্ছে, তাহলে সীতানাথ মানবে কিনা। বলাবাহুল্য সীতানাথের কাছে তিনি কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাননি।

নারী চরিত্র

বাসন্তী

নাট্যকার বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটক 'বাকি ইতিহাস'-এর মুখ্য বা কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বাসন্তী। বাসন্তী ও তার স্বামী শরদিন্দুর রবিবারের ছুটির সময় কাটানো প্রসঙ্গে উত্থাপিত নানা কথার মাধ্যমে রচিত হয় এ নাটকের কাহিনি। তাই নাট্যকাহিনির সৃষ্টি ও বিকাশে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকের তিনটি অঙ্কেই তার প্রসঙ্গ আছে। শরদিন্দুর চব্বিশ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল বাসন্তীর সঙ্গে। তাদের দাম্পত্য জীবন এঘারো বছরের। বাসন্তী কোন এক স্কুলের শিক্ষিকা মাঝে মাঝে সে মিষ্টি মিষ্টি গল্পও লেখে এবং টাকাও পায়। গত একমাস ধরে প্লটের অভাবে সে গল্প লিখতে পারেনি। একটা সহজ-সরল প্লট চায় সে। শিক্ষিতা বাসন্তী সুগৃহিণী। সংসারোপযোগী বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে ঘরগোছানোর মানসিকতা সম্পন্না ও স্বনির্ভরশীলা স্ত্রীর পরিচয় এই আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাসন্তী শুধুমাত্র সুগৃহিণী নয়, সৃষ্টিশীল গল্প রচনায়ও পারদর্শিনী। পরপর কয়েকটি গল্প রচনায় যশ ও অর্থ দুই-ই অর্জন করে পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে। ভাল প্লটের অভাবে এখন সে গল্প লিখতে পারেনি। বাসন্তীর এই গল্প শুনে শরদিন্দুর সুযুক্তিসঙ্গত সমালোচনা-গল্পটা একটু নাটকীয় হয়ে গেছে এবং সে নাটকীয়তাও কোনও কোনও জায়গায় অবাস্তব হয়ে উঠেছে। এই আত্মহত্যায় দীর্ঘদিন পোষিত কোন অস্বাভাবিকতা জাত মানসিক বিকার না থাকায় অনেকটা অবাস্তব ও নাটকীয় হয়ে গেছে। স্বামীর প্রতি বাসন্তীর একান্ত আনুগত্য তার চরিত্রের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। তার রচিত গল্প নিয়ে স্বামীর সমালোচনায় সে মর্মাহত নয়; বরং সম্মতির সুরেই স্বামীকে বলেছে সীতানাথকে নিয়ে গল্প লেখার কথা। তার রচিত গল্প মোটামুটি ভালই; অথচ স্বামীর রচিত গল্প শুনে সে সত্যিই মুগ্ধ এবং স্বামীর গল্পটি যে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি ভাল তা অকপটে স্বীকারও করেছে। সাহিত্য যে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে গঠিত এক অনুপম স্বীয় সৃষ্টি তাও জানা যায় শরদিন্দু-রচিত সীতানাথের গল্প শ্রবণে বাসন্তীর উক্তিতে-

"আগাগোড়া ভুল আমি মোটেই বলিনি। আমি শুধু বলছি-আসল কারণটা তুমি জানছ কী করে? তুমি যা লিখেছ, সে তো তোমার কল্পনা।"[তদেব, পৃষ্ঠা-৫২, তৃতীয় অঙ্ক]।

বাসন্তী সংসারী, বিষয়ী, হিসেবী। বাসুদেব একদিন রাত্রে তাঁদের বাড়িতে এসে এক মাসের মধ্যেই শরদিন্দুর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবার কথা বললে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় সে। এই সুসংবাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বাসন্তীর মুখ। বাসুদেব চা খেতে চাইলে বাসন্তীর আনন্দোচ্ছল উক্তিতে সে ভাব আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে: "আজ আপনাকে সত্যিই এক বালতি চা খাওয়াবো।" [তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫, তৃতীয় অঙ্ক]। নাটকের খুব উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত চরিত্র।

কণা

সীতানাথের মতো তার স্ত্রী-কণিকা বা কণাও চারবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। একের সঙ্গে অন্যের কোন মিল নেই। চার কণাই আলাদা। যেমন বলা যেতে পারে-

(ক) বাস্তব বা প্রকৃত কণা (প্রথম অঙ্ক),

(খ) বাসন্তীর অনুভূতিতে কণা (প্রথম অঙ্ক),

(গ) শরদিন্দুর অনুভূতিতে কণা (দ্বিতীয় অঙ্ক),

(ঘ) বাসন্তী-চরিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া কণা (তৃতীয় অঙ্ক)।

কণা সীতানাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী-কলকাতার ভবানীপুরে তাদের বাড়ি। তারা নিঃসন্তান, ভ্রমণপিপাসু-হৈ-হুল্লোড় ও আনন্দে মেতে থাকতে পছন্দ করে বেশি। কণার এক সময় মনে হয় তারা তিন বোনে সবকিছু ভাগাভাগি করে চলে। একটা ফাটা আয়না ভেঙ্গে নাকি খুব মারও খেয়েছে। তারা তিন বোনে অতি কষ্টে বড় হয়েছে। ছোটবেলাকার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাটা শিখিয়েছে; শিখিয়েছে টাকার লোভ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের লোভ। সেইজন্য সে গেছে নিখিলের কাছে। বাসন্তী-কল্পিত কণা চরিত্রায়ণে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সে স্বামীর প্রতি উদাসীন, পিতৃভক্তি-পরায়ণা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি কামনাতুরা এবং প্রখর ভোগপরায়ণা ইন্দ্রিয়সচেতন নারী। তার কাছে স্বামী বড় নয়, অর্থ-সম্পদই বড় এবং একমাত্র কাম্য। শরদিন্দুর গল্প থেকে বলা যায় কণা সুন্দরী, সংসারী, গৃহকর্মে নিপুণা, জীবনোপভোগী, অর্থ-সম্পদলোভী হতে পারে, আবার পতি সোহাগিনী-পতি গতপ্রাণা-সতী-সাধ্বী রমণীও হতে পারে। অর্থলোলুপতা ও একান্ত নির্ভরশীলতা বাসন্তীর কণাকে কলুষিত করলেও শরদিন্দুর কণা প্রেমে-ত্যাগে-অভিমানহীনতায় ও বিবাদহীনতায় এক মহিয়সী নারী।

বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটক 'বাকি ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে শরদিন্দু-রচিত গল্পে আছে পার্বতী ও গৌরীর পরিচয়। এই দুই সদ্যকিশোরীর আকর্ষণে সীতানাথ মনে-প্রাণে কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তা এই গল্পের মূল বর্ণনীয় বিষয়।

পার্বতী

সীতানাথ ও কণা বিবাহের তিন বছর পর গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'মাসের জন্য মধ্যপ্রদেশের চম্বলগড়ের জঙ্গলে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা প্রায় দেড় মাস থাকে। চম্বলগড়ের ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বিশ-পঁচিশটা মেটে ঘর নিয়ে একটা ছোট বসতি। সেখানকার প্রায় নির্জন জঙ্গলে সীতানাথ-কণার সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না; ছিল একমাত্র বনোয়ারীলাল ও তার কন্যা পার্বতী। বনোয়ারীলালের ফরেস্ট্রের চাকরি হওয়ায় ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জঙ্গলে ঘুরতে হয়। তাই তাদের বেশির ভাগ সময় কাটত পার্বতীরই সঙ্গে। মা-মরা পার্বতীর একা-একা ঘুরে সময় কাটত। ঘোরবার জায়গাও বেশি বড় নয়। জঙ্গলে যাওয়া নিষেধ ছিল তার বাবার। জঙ্গল খুব নিরাপদও ছিল না। পুলিশের তাড়া খেয়ে শহর থেকে চোর-ডাকাত প্রায়ই জঙ্গলে লুকাত। তাছাড়া বন্যজন্তুও ছিল কিছু। পার্বতী কাশ্মীরী রমণী। ফর্সা ফুটফুটে সুন্দর চেহারা তার। হাসলে তাকে ভারি সুন্দর দেখাত। আর বেশ হাসতেও পারত সে। প্রায় সারাদিন হাসত। কণার চেয়ে সীতানাথের সঙ্গেই ছিল তার বেশি ভাব। সীতানাথও তাকে ভীষণ ভালবাসত। অল্পক্ষণ দেখা না হলে যেন ছটফট করত দু'জনেই। তা দেখে কণার খারাপ লাগলেও আসলে পার্বতী ছিল বলেই চম্বলগড় তাদের ভাল লাগত। তা না হলে শুধু শালবন আর নদী নিয়ে তাদের সেখানে থাকা সম্ভব হত না। শরদিন্দু-রচিত গল্পে পার্বতীর ভূমিকা অনেক বেশি। যেমন-

(ক) পার্বতীই চম্বলগড়ের জঙ্গলে সীতানাথ-কণার ভ্রমণের সঙ্গিনী।
(খ) পাবর্তী প্রেমিকা। সে সীতানাথকে ভালবেসেছে; সীতানাথও ভালবেসেছে পার্বতীকে। আর সেইজন্যেই সীতানাথ সারাজীবন পার্বতীর কথা ভুলতে পারেনি, বিবেকের দংশনে ক্ষত য়ে শেষে আত্মহত্যাই করেছে।
(গ) পার্বতীর কারণেই সীতানাথ ক্লাসে 'লোলিটা' পড়ার অপরাধে কৃতী ছাত্র অশোককে এক্সপেল করেছে।
(ঘ) পার্বতীর বিপর্যয়ে সীতানাথ নিজেকেই দায়ী-খুনি ডাকাত মনে করে দশ বছর স্ত্রী-সংসর্গ থেকে নিজেকে কাজ ও দায়িত্বের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করেছে।
সুতরাং বলা যায় কাহিনি সৃষ্টিতে, চরিত্রের জটিলতা ও পরিণতি দানে, সর্বোপরি জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে পার্বতী এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র; নাটকে তার ভূমিকা অনেক বেশি।

গৌরী

দ্বিতীয় অঙ্কে শরদিন্দু-রচিত গল্প-কাহিনিতে গৌরী-প্রসঙ্গ আছে। প্রাক্তন অধ্যাপক ও সীতানাথের স্কুলের সেক্রেটারি বিধুভূষণবাবুর নাতনি গৌরী। তার বয়স মাত্র আট বছর। সীতানাথকে সে 'কাকাবাবু' বলে ডাকে এবং সীতানাথও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গৌরীর প্রতি স্নেহ প্রেমে পরিণত হয় এবং গৌরীর প্রতি জৈবিক আকর্ষণও অনুভব করে-যা অসম্ভব হলেও ধ্রুব সত্য। সীতানাথের কাছে পার্বতী হয়ত অতীত, কিন্তু গৌরী বর্তমান শরদিন্দু-রচিত কাহিনিতে পরিণতি দানে গৌরী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে সচেতনভাবে কাহিনিতে ভূমিকা না নিলেও তাকেই অবলম্বন করে কাহিনি সম্পূর্ণতা পেয়েছে-সীতানাথ নাবোকোভের লোলিটার সত্যতা স্বীকার করেছে, স্কুলের কৃতী ছাত্র অশোককে এক্সপেল করা বন্ধ করেছে, নিজেই আত্মহত্যা করে গৌরীকে যেমন বাঁচিয়েছে, তেমনি আবার পার্বতীর প্রতি অপরাধ বোধের প্রায়শ্চিত্তও করেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও গৌরী পরোক্ষে শরদিন্দুর কাহিনিতে মধ্যমণি হয়ে আছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। বাকি ইতিহাস নাটকে চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৫ 'বাকি ইতিহাস' নাটকের সংলাপ

নাট্যসংলাপ জীবনের এই গতিশীল রূপটিকেই মেলে ধরে। নাটক সংলাপময়। গ্রীক নাটকে বা ফরাসী ধ্রুপদী নাটকে দর্শক কোনও Action দেখতে উৎসুক নন, তাঁরা সংলাপই উপভোগ করেন। সংলাপের এমন কি গুণ বা আকর্ষণ আছে-যা দর্শককে ধরে রাখতে পারে। বৌলটন নাটকের সংলাপের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন- "The dialogue of a play must be such that the normally competent can speak his lines without stumbling, stopping for breath in the wrong place or speaking with so little animation or such a false intonation that it is obvious he does not understand what he is saying; it must also be such that the audience for whom the play is written can take in most of what is being said in the time available." [" The Anatomy of drama", Page-100)।

যথার্থ নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বৌলটন দেখাতে চেয়েছেন- অভিনেতা যেন অনায়াসেই তা উচ্চারণ করতে পারেন, কোথাও যেন হোঁচট না খান, কথা মুখে আটকে না যায়, বিকৃত উচ্চারণ না করেন এবং দর্শক যেন বুঝতে পারেন ও রসগ্রহণে সমর্থ হন। বৌলটনের এ বক্তব্য মুখ্যত সংলাপের ভাষাকেন্দ্রিক সংলাপের কাজ নানা প্রকারের-সংলাপের আরও নানা দিক আছে।

(ক) সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উন্মোচন করে।
(খ) সংলাপের সাহায্যে চরিত্র আপন স্বভাব ও প্রকৃতিকে মেলে ধরে।

(গ) চরিত্রের নিজস্ব ভাঙ্গি হল সংলাপ। যার সাহায্যে বক্তার স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচিশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) গল্প-উপন্যাসের সংলাপের সঙ্গে নাটকীয় সংলাপের কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ সংলাপের মতো নাট্যসংলাপ আবেগ, অনুভূতি, মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন- (ক) গতিময়তা, (খ) চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উপস্থাপনা, (গ) চমক সৃষ্টি ও (ঘ) কৌতূহল সৃষ্টি ইত্যাদি।

(ঙ) নাট্যসংলাপ সম্পূর্ণ objective ব্যাপার। প্রেক্ষাগৃহের নানা শ্রেণীর দর্শকের বোধগম্য হওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি দর্শকচিত্তকে ধরে রাখার ক্ষমতা গুণও তার থাকা বাঞ্ছনীয়।

(চ) বাক্-সংক্ষিপ্তি সংলাপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(ছ) নাট্যকারের মনোগত অভিপ্রায়টিও সংলাপেই সিদ্ধ হয়।

(জ) সংলাপকে মঞ্চ ব্যবস্থার উপযোগী হতে হবে। অর্থাৎ মঞ্চ-বাস্তবতা রক্ষা করা নাটাসংলাপের একটি বিশেষত্ব।

শরদিন্দু কলেজের অধ্যাপক। পদোন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতায় অপ্রাপ্তি জনিত বেদনায় সে যে বেদনাহত তা তার সংলাপে প্রকাশিত। তাদের কলেজের বাংলা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হরেকৃষ্ণবাবু চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ঐ পদ অবশ্যই শরদিন্দু পাবে। বাসুদেবের এই কথায় শরদিন্দুর সংলাপে অভিমানাহত হতাশাজনক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— "আমার আর তেল দিয়ে কোনও লাভ নেই। তেরো বছর লেকচারার আছি, আরও তেরো বছর থাকবো।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৫]।

শরদিন্দু বেঁচে গেলেও বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে তা বাসুদেবের প্রতি তার সংলাপেই প্রকাশিত— "ইতিহাস বাসুদেব। বাকি ইতিহাস। বাকি ইতিহাস।" (তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৬৬)। শরদিন্দুর এমন অ্যাবসার্ডধর্মী সংলাপ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। বাসন্তী-রচিত গল্পে কণার দু'একটি সংলাপ উদ্ধৃত করলেই সীতানাথ মানসিক রোগী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই গৌরীকে বাঁচাতে এবং অসহ্য মানসিক অবস্থা থেকে নিজে বাঁচতে সীতানাথ যে আত্মহত্যা করেছে, তা আত্মহত্যা করার সময়ে তার সংলাপেই প্রকাশ পায়— "সে ডাকাতের এতোদিন ফাঁসি দেওয়া হয়নি রে। আজ দেবো। গৌরী। গৌরী। তোর কোনও ভয় নেই। সে ডাকাত তোকে ছুঁতে পারবে না। তাকে আমি ফাঁসি দেবো। পার্বতীকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু তোর কোনও ভয় নেই। তোর কাকাবাবু-সে ডাকাতকে ফাঁসি দিয়ে দেবে।" [দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৫০] সীতানাথ যে খল চরিত্রের নয়, মনের মধ্যে সদ্যকিশোরীর প্রতি লোভাতুর হলেও বাস্তবে সে অনেকটা সংযতই ছিল এবং তার এমন আকর্ষণ বা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জন্যই যে পার্বতীর সর্বনাশ ও গৌরী সর্বনাশের পথে এবং এই সমস্যা সংকুলতা থেকে পরিত্রাণ পেতেই যে সীতানাথের আত্মহত্যা-তা সীতানাথের এই সমস্ত সংলাপ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তৃতীয় অঙ্কে শরদিন্দু ও সীতানাথের সংলাপে অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের, নাটকীয়তা, গতিশীলতা, চমকসৃষ্টি, ঘটনা ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। শরদিন্দুর প্রতি সীতানাথের সংলাপে জানা যায়, সমকালীন জটিল জীবন-যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে যারা আত্মহত্যা করে।

সীতানাথের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে দাঙ্গা-যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ-মানুষের তৈরি মারণাস্ত্রে মানুষেরই বিনষ্টি শরদিন্দুর প্রতি সীতানাথের সংলাপে তা মর্মন্তদ ভাষায় প্রকাশিত হয়ে মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছে — "নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ-সব কিছু চলবে, সবকিছু মানুষই করবে-তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু'বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে। এরা সবাই মানুষ। তোমার মতো। আমার মতো। এরা সবাই জীবনের এক একটা অর্থ খুঁজে নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে।" [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৬২]।

সংক্ষিপ্ত সংলাপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য নাটকে কোথাও সংলাপ দীর্ঘায়ত নয়। শরদিন্দু-বাসন্তীর, সীতানাথ-কণার ছোট ছোট সংলাপে তাদের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন টুকরো টুকরো চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শরদিন্দু-রচিত গল্পে আত্মহত্যা করবার অব্যবহিত পূর্বে কণার সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে তাদের —।

"শরদিন্দু। তুমি যাও শরদিন্দু।

সীতানাথ। আমি সীতানাথ।" [তৃতীয় অঙ্ক, পৃষ্ঠা-৬৪]

সংলাপের একটি অংশ স্বগতোক্তি নাটকে তার প্রয়োগ দেখা যায়। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে জনান্তিকে-স্বগতোক্তির ব্যবহারও আছে। প্রবল অভাবের কারণে কণাদের তিন বোনের জীবন খুব দুঃখ-কষ্টের ছিল। কণার বড় দিদির বিবাহ হলেও শ্বশুরবাড়িতে মার খেয়ে ও গাধাখাটুনি খেটে মারা যায়, তার মেজদির বিয়ে না হলেও থাকা-খাওয়ার মতো আশ্রয় পেয়েছে, অর্থাৎ রক্ষিতার জীবন নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কণা আপন মনে যে উক্তি করেছে তা স্বগতোক্তিরই নামান্তর-

"কণা।। (আপন মনে) এক এক সময়ে মনে হয়-মেজদি ভালোই করেছে।" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-১৬]

এক আগন্তুক কোর্টের বেলিফ সমন নিয়ে এলে সীতানাথ ও আগন্তুকের সংলাপের মাঝে সীতানাথের প্রতি কণার 'অস্ফুট রে' উক্তি জনান্তিকেরই নামান্তর- "আগন্তুক। ভালো করে কথা বলবেন মশায়। কোর্ট বেলিফ বলেই 'তুমি' বলে কথা বলবার কোনও রাইট নেই আপনার-

সীতানাথ। আচ্ছা থাক । চুপ করো।
কণা। (অস্ফুট স্বরে) কোর্ট বেলিফ ?"
কণা। (আগের মতো) জমি নেই ?" [প্রথম অঙ্ক, পৃষ্ঠা-১৮-১৯]।

-এই জনান্তিকেয় উক্তিদ্বয় বাসন্তী-রচিত গল্পে বিশেষ climax সৃষ্টি করেছে। কণা জেনেই গেছে গড়িয়ার জমি আর নেই।

'বাকি ইতিহাস' অ্যাবসার্ড নাটক। এর সংলাপের প্রয়োগে, সহজ-সরল ভাষার ছোট ছোট সংলাপে অ্যাবসার্ড্ রক্ষিত হয়েছে। এ সংলাপের ভাষা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পারেন, শ্রোতাও বুঝতে পারেন ও রসগ্রহণে সমর্থ হন। নাটকটি সমাজ-সমস্যামূলক হওয়ায় ভাষাও তদনুরূপ হয়েছে, করুণা নয়, বাস্তবতায় পূর্ণ। সংলাপ ব্যবহারে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব উন্মোচিত হয়েছে, চরিত্র তার আপন স্বভাব-প্রকৃতি মেলে ধরেছে, এ সংলাপ যথার্থ চরিত্রোপযোগী হয়েছে এবং মঞ্চবাস্তবতা রক্ষা করেছে। সর্বোপরি এ নাটকে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকারের মনোগত অভিপ্রায়টিও সুচারুরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে সংলাপের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি থেকে জানতে পারবেন স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়, প্রিয়জন সবাই থাকা সত্ত্বেও বেঁচে মরার মতো মনে বেদনা, হাহাকার, নৈরাশ্য নিয়ে মানুষকে সারা জীবন কাটাতে হয়। এই দিকটি সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম।
- নাটকের প্রতিটি চরিত্র সময়ের নিরিখে মনের দিক থেকে যে ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তা আধুনিক জীবন যাত্রার কথাই ধরা পরে। এই সম্পর্কে ধারণা হয়েছে।
- নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে যুগ-যন্ত্রণার কাতর আর্তি যে ভাবে ধ্বনিত হতে দেখা গিয়েছে তা থেকে শিক্ষার্থীরা সহজেই জানতে পারবেন সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপটি। এই সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫.৮ অতিরিক্ত পঠন

ঘোষ, ড. অজিতকুমার (১৯৯৮); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
ঘোষ ও মিত্র (২০১৫); বাদল সরকার নাটক সমগ্র (২ খণ্ড); কলকাতা: ঘোষ ও মিত্র পাবলিশার্স প্রা: লি:
চৌধুরী, দর্শন (২০০৯); নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার ; একুশ শতক, কলকাতা: পুস্তক বিপণি
চন্দ্র দীপক (২০১৯); বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা; কলকাতা: দে'জ

ভট্টাচার্য সাধনকুমার (২০১৯); নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ; কলকাতা: দে'জ
মুখোপাধ্যায়, ড. তরুন(২০০৫); বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ: এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস, কলকাতা: সাহিত্যলোক
মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর (২০০৩); নাট্যতত্ত্ব বিচার; কলকাতা: করুণা প্রকাশনী

✓ ৫.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : বাদল সরকার 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি চিরাচরিত প্রথা না মেনে, গল্প রচনার ছলে ছোট ছোট কয়েকটি গল্পের সমন্বয়ে নাটকটির কাহিনি নির্মাণ করেন।..... জীবনের অর্থ যখন থাকছে না, তখন অভ্যাসকে সম্বল করে বাঁচবার ভাণ করছে। যেমন সীতানাথ করেছিল, শরদিন্দু করছে।..... এই ভাবে বিভিন্ন ঘটনা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরে নাটকের কাহিনি অংশ তুলে ধরতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৫.৩ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর : নাটকের প্রধান উপাদান হল চরিত্র। W. H. Hudson বলেছেন, 'Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.' নাট্যচরিত্রের মাধ্যমেই নাট্যকার তুলে ধরেন নাট্যবিষয়।..... আলোচনাকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চরিত্রগুলিকে দুটি অংশে ভাগ করে চরিত্রের নানা দিক উন্মোচন করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৫.৪ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর : নাট্যসংলাপ জীবনের এই গতিশীল রূপটিকেই মেলে ধরে। নাটক সংলাপময়।..... আলোচ্য নাটকে কোথাও সংলাপ দীর্ঘায়ত নয়।..... এই ভাবে নাটকের সংলাপ তুলে এনে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৫.৫ অংশ)

⑦ ৫.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের কাহিনি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করুন।
২। 'বাকি ইতিহাস' নাটকের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের প্রতিভা তুলে ধরুন।
৩। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে সংলাপের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

*** *** ***